১৮.৯.১ প্রজনন-এর ধারণা (Concept of Fertility)

সন্তান উৎপাদনকে **প্রজনন** বা **ফার্টিলিটি** (Fertility) বলে। (Fertility refers to the occurrence of birth.–Chandna. R.C., 2002)। **টমসন** এবং **লুইস** (Thompson and Lewis, 1929)-এর মতে, কোনো নারী বা সামগ্রিকভাবে নারীজাতির সন্তানের জন্ম দেওয়ার কাজকে প্রজনন বলা হয়। (Fertility is generally used to indicate the actual reproductive performance of a woman or groups of women)। স্থূল জন্মহার অনুসারে (crude birth rate) প্রজনন পরিমাপ করা হয়। প্রজনন একটি জৈবিক ঘটনা। স্থান ও কালের প্রেক্ষিতে প্রজননের হার পরিবর্তিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বা অঞ্চলে প্রজনন-ধারার পর্যায়ক্রমিক রৈখিক রূপকে **প্রজনন-প্রবাহ বা প্রজনন-ধারা** (fertility trend) বলা হয়। প্রজনন-প্রবাহ অনুসারে পৃথিবীর দেশগুলিকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন— (১) উচ্চ প্রজনন-প্রবাহ-বিশিষ্ট দেশ (countries of high fertility trends) এবং (২) নিম্ন প্রজনন প্রবাহবিশিষ্ট দেশ (countries of low fertility trends)।

১৮.৯.২ উচ্চ প্রজনন-প্রবাহবিশিষ্ট দেশ (High Fertility-trend Countries)

এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত প্রকৃতির। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলি এই প্রবাহের অন্তর্গত।

দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ, ভুটান ও নেপালকে উচ্চ প্রজনন-প্রবাহের দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই দেশগুলিতে জনসংখ্যার চাপ বেশি এবং বাল্যবিবাহের প্রাধান্য রয়েছে।

নিম্ন জীবনযাত্রার মান, অশিক্ষা এবং ধর্মীয় বিধি-নিষেধ এই দেশগুলিতে উচ্চ প্রজনন-হারের কারণ বলে সমাজ-বিজ্ঞানীরা মনে করেন। তবে বিগত পঁয়ত্রিশ বছরে দক্ষিণ এশিয়ার এই দেশগুলিতে প্রজনন-হার কমলেও পৃথিবীর গড় প্রজনন-হারের তুলনায় এই দেশগুলির প্রজনন-হার এখনও বেশি।

দেশ	HDI র‍্যাঙ্ক ২০০৯	১৯৭০-'৭৫ সাল (মহিলা-প্রতি নবজাতকের সংখ্যা) (Births per woman)	২০০০-'০৫ সাল (মহিলা-প্রতি নবজাতকের সংখ্যা) (Births per woman)	২০০৫-২০১০ সাল (মহিলা-প্রতি নবজাতকের সংখ্যা) (Births per woman)
ভারত	১৩৪	৫·৩	৩·১	২·৮
বাংলাদেশ	১৪৬	৬·২	৩·২	২·৪
পাকিস্তান	১৪১	৬·৬	৪·৩	৪·০
মালদ্বীপ	৯৫	৭·০	৪·০	২·১
ভুটান	১৩২	৬·৭	২·৯	২·৭
নেপাল	১৪৪	৫·৮	৩·৭	২·৯
শ্রীলঙ্কা	১০২	৪·১	২·০	২·৩
পৃথিবীর গড়		৪·৫	২·৬	২·৬

[উৎস : Human Development Report, 2007-08, 2009]

সংশ্লিষ্ট সারণিটি লক্ষ করলে দেখা যায় যে, পাকিস্তানে প্রজনন-হার সবচেয়ে বেশি এবং শ্রীলঙ্কাতে সবচেয়ে কম। ভারতে প্রজনন-হার বিগত ৩৫ বছরে অর্ধেক হয়েছে। ভুটান, নেপাল বা পাকিস্তানেও প্রজননের-হার হ্রাস পেয়েছে।

প্রসঙ্গত আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে সোমালিয়া, তাঞ্জানিয়া, জিম্বোবোয়ে, বুরকিনাফাসো, উগান্ডা, বেনিন, মালি প্রভৃতি দেশের গড় প্রজনন-হার মহিলা-প্রতি ৭ জন। ১৯৭০ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে এই উচ্চ প্রজনন-হার প্রায় স্থির অবস্থায় রয়েছে। অশিক্ষা, কুসংস্কার, দারিদ্র্য এবং পেশাগত সুযোগ ও বৈচিত্র্যের অভাব এই অতি উচ্চপ্রজনন-হারের কারণ বলে সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন।

লাতিন আমেরিকার দেশগুলির মধ্যে বলিভিয়া, নিকারাগুয়া, হন্ডুরাস, হাইতি প্রভৃতি দেশের প্রজনন-হারের প্রসার মহিলা-প্রতি ৬ থেকে ৪ জন। এখানেও বিগত ৩৫ বছর ধরে প্রজননের হার কমেছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় লাও, তিমর-লেসতে ইত্যাদি দেশগুলিতে গড় প্রজনন-হার মহিলা-প্রতি ৭ জন। উন্নয়নশীল দেশের সমাজ ও অর্থনীতির ধারা অনুসারে পৃথিবীর এই অঞ্চলেও প্রজননের-হার বেশি। বিগত ৩৫ বছরে প্রজনন-হারে কোনো লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেনি।

১৮.৯.৩ নিম্ন প্রজনন-প্রবাহবিশিষ্ট দেশ (Low Fertility-trend Countries)

এই দেশগুলির অধিকাংশই অর্থনৈতিকভাবে উন্নত। শিক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষার উন্নত ব্যবস্থা এদের অধিকাংশ দেশগুলিতেই রয়েছে। নিম্ন প্রজনন-প্রবাহের দেশগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

(১) প্রথম শ্রেণির নিম্ন প্রজনন-প্রবাহবিশিষ্ট দেশগুলি হল জাপান, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, আর্জেন্টিনা এবং পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের দেশ। পৃথিবীর এই অঞ্চলে ২০০০-'১০ সালের হিসাব অনুযায়ী, গড় প্রজনন-হার হল মহিলা-প্রতি ১·৭। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে অতি অল্প সময়ের জন্য পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের দেশগুলিতে প্রজনন-হার বৃদ্ধি পেলেও এই প্রবণতা স্থায়ী হয়নি। ১৯৬০ সালের পর থেকে এই প্রথম শ্রেণির নিম্ন প্রজনন-প্রবাহের দেশগুলিতে প্রজননের সর্বনিম্ন হার প্রায় স্থায়ী হয়ে রয়েছে।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণির নিম্ন প্রজনন-প্রবাহের দেশগুলি মূলত দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে অবস্থিত। এই দেশগুলি হল চেক প্রজাতন্ত্র, রুমানিয়া, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, পোর্তুগাল, ইতালি, গ্রিস ইত্যাদি। এই দেশগুলির গড় প্রজনন-হার ২০০০-'১০ সালের হিসাব অনুযায়ী, প্রতি হাজারে প্রায় ২ জন। এখানে ১৯৫০ সালের পর থেকে প্রজননের হার ধীর ও নিম্নমুখী।

(৩) তৃতীয় শ্রেণির নিম্ন প্রজনন-প্রবাহবিশিষ্ট দেশ হল ইজরায়েল। এখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে প্রজননের হার ক্রমশ কমে চলেছে। এখানকার প্রজনন-হার হল মহিলা-প্রতি ২·৯ জন।

১৮.৯.৪ উন্নয়নশীল দেশগুলিতে উচ্চ প্রজনন-হারের কারণ (Causes of High Fertility in the Developing Countries)

জাপানের মতো উন্নত দেশে যেখানে বার্ষিক গড় প্রজনন-হার মহিলা-প্রতি ১·৩ জন (HDR-2007-08), সেখানে আফ্রিকার অনুন্নত দেশ যেমন— তানজানিয়া, সোমালিয়া প্রভৃতি স্থানের বার্ষিক গড় প্রজনন-হার মহিলা-প্রতি গড়ে ৭ জন। সুতরাং, উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে উচ্চ প্রজনন-হারের কারণ সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানীরা আলোকপাত করেছেন।

(১) **দারিদ্র্য** ঃ সমাজবিজ্ঞানী **কাস্ত্রো** (Castro)-এর মতে, দারিদ্র্য উচ্চ প্রজননের অনুঘটক (catalyst)। প্রকৃতপক্ষে উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে বহু এলাকায় দারিদ্র্যের কারণে এবং বাড়ির বাইরে কাজের সম্ভাবনা কম থাকার জন্য স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে সাক্ষাতের সুযোগ অনেক বেশি থাকে। ফলে সাধারণ জৈবিক কারণেই প্রজনন বাড়ে।

(২) **বাল্যবিবাহ ঃ** ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান প্রভৃতি উন্নয়নশীল দেশগুলির সামাজিক কাঠামো ও পারিবারিক গঠন লক্ষ করলে দেখা যায় যে, এখানে বিশেষত গ্রামাঞ্চলে বাল্যবিবাহের প্রচলন বেশি। ফলে বিবাহের পরে অল্পবয়সি মেয়েদের মাতৃত্বের সুযোগ বাড়ে এবং প্রজনন-হার বৃদ্ধি পায়।

(৩) **বহুবিবাহ এবং ধর্মীয় অনুশাসন ঃ** উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কিছু কিছু সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বহুবিবাহের প্রচলন আছে। একই সাথে জন্ম নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কৃত্রিম পদ্ধতির অবলম্বনের ব্যাপারেও ধর্মীয় গোঁড়ামি উচ্চ প্রজননে ইন্ধন যোগায়।

(৪) **স্ত্রী-শিক্ষায় অভাব ঃ** স্ত্রী-শিক্ষার অভাবের কারণেও প্রজনন-হার বৃদ্ধি পায়। মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার হার বাড়লে চাকুরির সুযোগ বাড়ে। ফলে পেশাগত বাধ্যবাধকতার কারণে মহিলাদের মধ্যে অধিক সন্তান জন্মদানের প্রবণতা বা উৎসাহ হ্রাস পায়। উন্নত দেশগুলির অভিজ্ঞতার দেখা গিয়েছে যে, শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে বাল্যবিবাহের প্রচলন অত্যন্ত কম। শুধু তাই নয়, তারা সংস্কৃতিমনস্ক এবং স্বাস্থ্যের প্রতি সচেনতার কারণেও জন্মশাসনের ব্যাপারে যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। সুতরাং, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে স্ত্রী-শিক্ষার অভাবের জন্য মহিলাদের মধ্যে এই উৎকৃষ্টতার প্রবণতাগুলি দানা বাঁধতে পারে না।

(৫) **সামাজিক চাপ ও পুত্রসন্তান জন্ম দেওয়ার আগ্রহ ঃ** উন্নয়নশীল দেশগুলিতে পারিবারিক চাপ, অত্যাচার প্রভৃতি বাধ্যবাধকতার কারণে অনেক সময় মহিলাদের মধ্যে কন্যাসন্তানের চেয়ে পুত্রসন্তান জন্ম দেওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে। ফলে পুত্রসন্তানের প্রত্যাশায় মহিলারা বহুবার গর্ভধারণে বাধ্য হন। এক্ষেত্রেও প্রজননের হার বেড়ে যায়।

(৬) **কৃষির প্রাধান্য এবং অন্যান্য পেশাগত সুযোগের অভাব ঃ** উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কৃষিকাজ এখনও শ্রম-নিবিড় (labour intensive) প্রকৃতির। ফলে কৃষিক্ষেত্রে শ্রমিকের প্রয়োজন মেটানোর জন্য কৃষক-পরিবার নিজেই নিজ নিজ সন্তানের মাধ্যমে ওই প্রয়োজনীয় শ্রমের জোগানের ব্যবস্থা করে নেয়। ফলে প্রজনন-হার বাড়ে। এ ছাড়া অন্যান্য পেশাগত সুযোগের অভাবের জন্য গরিব অশিক্ষিত মানুষ স্বল্প মজুরির বিনিময়ে মুটে, মজুর, রিকশা টানা প্রভৃতি প্রান্তিক কাজে নিযুক্ত হতে বাধ্য হয়। কাজেই অধিকতর প্রজননের মাধ্যমে অধিকতর শ্রমিকের জোগান দেওয়া ছাড়া এইসব মানুষদের আয় বাড়ানোর আর কোনো উপায় থাকে না।

(৭) **পরিবার পরিকল্পনায় দুর্বলতা ঃ** উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিভিন্ন কারণেই পরিবার পরিকল্পনার কাজ কখনও অর্থাভাবে, কখনও প্রশাসনিক গাফিলতির জন্য, কখনও সুযোগ্য কর্মীর অভাবে বা অন্যান্য অসুবিধার কারণে ব্যাহত হয়। ফলে জন্মনিয়ন্ত্রণের ধার্য-লক্ষ্যে প্রশাসনের পক্ষে অনেক সময়েই পৌছানো সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় প্রজনন-হার বাড়ে।

(৮) **উচ্চ মৃত্যুহার ঃ** উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মৃত্যুহার সাধারণত বেশি। এই কারণে বহু পরিবারেই প্রচুর শিশুর জন্ম দেওয়া হয়, যাতে কয়েকটি শিশুর মৃত্যু হলেও পরিবার যেন শেষ পর্যন্ত সন্তানহীন না হয়। ফল হল উচ্চ প্রজনন-হার।

১৮.৯.৫ উন্নত দেশে নিম্ন প্রজনন-হারের কারণ (Causes of Low Fertility in the Developed Countries)

(১) **জীবনযাত্রার উচ্চমান ঃ** উন্নত জীবনযাত্রা নিম্ন প্রজনন-হারের অন্যতম কারণ। কেন-না, উন্নত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত নারী ও পুরুষ কখনওই অধিক সন্তানের জন্ম দিতে মানসিকভাবে প্রস্তুত নয়। অধিক সন্তানের জন্য অতিরিক্ত ব্যয়ভারে তাদের নিজেদের জীবনযাত্রার মান নেমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। স্যাডলার, স্পেনসার, ডাবলডে, লাইবেনস্টাইন প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীরা এই মতের স্বপক্ষে নানান যুক্তি দিয়েছেন।

(২) **শিক্ষার সুযোগ ও সমাজসচেতনতা ঃ** উন্নত শিক্ষার সুযোগ মানুষকে পরিবার ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ করে তোলে। ফলে শিক্ষিত স্ত্রী ও পুরুষ কখনওই পরিবারের আয়তন সেইভাবে বাড়িয়ে তোলেন না, যাতে নিজেদের ও সার্বিকভাবে সমাজের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হয়। ফলে প্রজনন-হারের মাত্রা কম থাকে।

(৩) **স্ত্রী স্বাধীনতা এবং পুরুষের উপরে নারীর ক্রমহ্রসমান নির্ভরশীলতা ঃ** উন্নত দেশগুলিতে শিক্ষা ও পেশার সুযোগ উন্নয়নশীল দেশগুলির তুলনায় অনেক বেশি থাকে বলে, পুরুষের উপরে ভরণ-পোষণের জন্য নারীর নির্ভরশীলতা কমে যায়। এমতাবস্থায় পুরুষশাসিত সমাজের অতিরিক্ত শাসন বা পারিবারিক চাপের কাছে বাধ্য হয়ে মহিলাদের সন্তান ধারণের প্রয়োজন হয় না। এই কারণেও প্রজনন হার হ্রাস পায়।

(৪) **ছোটো পরিবারের প্রতি আগ্রহ ঃ** ধনী পরিবারে এবং উন্নত সমাজে ছোটো পরিবারের প্রতি একটি স্বাভাবিক আকর্ষণ তৈরি হয়েছে। কারণ ছোটো পরিবার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য যে সার্বিক নিরাপত্তার বাতাবরণ তৈরি করে, বড়ো-দরিদ্র পরিবারে সন্তান-সন্ততিকে সেই নিরাপত্তা দেওয়া পিতা-মাতার পক্ষে কখনওই সম্ভব হয় না। ফলে উন্নত দেশগুলিতে প্রজনন-হার কম।

১৮.৯.৬ মরণশীলতার ধারণা (Concept of Mortality)

রাষ্ট্র সংঘের 'Principles of Vital Statistics System' (১৯৫৩) শীর্ষক নিবন্ধে মরণশীলতা বা মর্টালিটি (Mortality)-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, Morality is "premanent disappearence of all evidence of life at any time after birth has taken place", অর্থাৎ জন্মের পরে কোনো সময়ে জীবনের সমস্ত প্রমাণ চিরতরে বিলুপ্ত হওয়াকে মরণশীলতা বা মর্টালিটি বলে। জন্ম না হলে মৃত্যু হয় না। সুতরাং, জন্মের আগে অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে মৃত্যুর ঘটনাকে মরণশীলতা বলা যায় না। সেক্ষেত্রে গর্ভস্থ ভ্রূণের অপমৃত্যু মরণশীলতা নয়।

রাষ্ট্রপুঞ্জের দেওয়া মরণশীলতার এই সংজ্ঞা পৃথিবীর সব দেশে প্রযোজ্য নয়। যেমন, মরক্কো এবং নিরক্ষীয় গিনিতে কোনো শিশু, জন্মের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মারা গেলে, বা সিরিয়া, ফরাসি গিনি ও আলজিরিয়ার মতো দেশে নবজাত শিশুর জন্মের নথিবদ্ধকরণের (registration of birth) আগে যে কাজের জন্য কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত সময় লাগতে পারে ওই শিশুর মৃত্যু হলে তাকে "স্টিল-বর্ণ" (Still born) অর্থাৎ "মৃতজাত শিশু" বা গর্ভপাত হিসেবেই দেখা হয়। সুতরাং, স্থূলমৃত্যু হার (Crude Death Rate — CDR) হিসাব করার সময় ওই "মৃতজাত শিশু"-দের হিসাবের মধ্যে ধরা হয় না।

১৮.৯.৭ মৃত্যুর কারণ (Causes of Death)

রাষ্ট্র সংঘের দেওয়া সংজ্ঞার উপরে ভিত্তি করে মৃত্যুর কারণকে পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন—

(১) **প্রথম শ্রেণির মৃত্যুর কারণ ঃ** মহামারি (epidemic), পরজীবীঘটিত রোগ (parasitic), ফুসফুসজনিত রোগ।

(২) **দ্বিতীয় শ্রেণির মৃত্যুর কারণ ঃ** এইড্‌স, ক্যানসার।

(৩) **তৃতীয় শ্রেণির মৃত্যুর কারণ ঃ** রক্তচাপজনিত রোগ, শ্বাসনালি ও রক্তনালির রোগ।

(৪) **চতুর্থ শ্রেণির মৃত্যুর কারণ ঃ** হত্যা, আত্মহত্যা, দুর্ঘটনা।

(৫) **পঞ্চম শ্রেণির মৃত্যুর কারণ ঃ** শিশুরোগ, লিভারের রোগ, আলসার।

১৮.৯.৮ বংশবৃদ্ধির অপচয় বা রিপ্রোডাকটিভ ওয়েসটেজ (Reproductive Wastage)

জীবনের সঞ্চার থেকে ওই নবজাত শিশুর পাঁচবছর বয়সের মধ্যে মৃত্যু হলে, তাকে বংশবৃদ্ধির অপচয় বা রিপ্রোডাকটিভ ওয়েসটেজ (Reproductive Wastage) বলে।

রিপ্রোডাকটিভ ওয়েসটেজকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

(১) **জন্মগ্রহণের পূর্বে মৃত্যু (Pre-natal mortality)**

(২) **শিশুমৃত্যু (Infant mortality) :** জন্মের দ্বিতীয় মাস থেকে পাঁচবছর বয়সের মধ্যে মৃত্যু।

(৩) **ছেলেবেলায় মৃত্যু (Childhood mortality) :** পাঁচবছর থেকে পনের বছর বয়সের মধ্যে মৃত্যু।

১৮.৯.৯ উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শিশুদের মধ্যে উচ্চ মৃত্যুহারের কারণ (Causes of High Infant Mortality in the Developing Countries)

(১) **চিকিৎসার অভাব :** উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শিশুমৃত্যুর হার বেশি। তার অন্যতম কারণ হল চিকিৎসার অভাব। বিশেষত, গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা কম থাকার জন্য শিশুরা প্রয়োজনের সময় জীবনদায়ী চিকিৎসার সুযোগ থেকে অনেক ক্ষেত্রেই বঞ্চিত হয়।

(২) **স্বল্প আয় ও জীবনযাত্রার নিম্ন মান :** উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জীবনযাত্রার মান নিচু। ফলে অনেকক্ষেত্রেই অসুস্থ শিশুর বাবা-মায়ের পক্ষে শিশুর প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করা কঠিন হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবও শিশুমৃত্যুর উচ্চ হারের অন্যতম কারণ। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, অপুষ্টিতে জর্জরিত মায়েদের পক্ষে যেমন স্বাস্থ্যবান শিশু জন্ম দেওয়া সম্ভব নয়, তেমনি জন্ম থেকেই অপুষ্টিতে আক্রান্ত হলে নবজাত শিশুর পক্ষেও বেশি দিন বেঁচে থাকা সম্ভব হয় না। বস্তুতপক্ষে, জীবনযাত্রার মান উন্নত হলে এই সমস্যার অনেকটাই কাটিয়ে ওঠা যায়।

(৪) **অবৈধ জন্মের কারণে মৃত্যু :** পিতৃপরিচয়হীন শিশু অনেকক্ষেত্রে, বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে, জন্মের পরেই পরিত্যক্ত হয়। ফলে শিশু মারা যায়।

(৫) **শিক্ষার অভাব :** শিশুর পূর্ণ দায়িত্ব নিতে অক্ষম অশিক্ষিত পিতা-মাতা অনেকক্ষেত্রেই শিশুমৃত্যুর কারণ। প্রয়োজনে চিকিৎসার সুযোগ না-নেওয়া, শিশুকে রোগ-প্রতিষেধক টিকা না-দেওয়া, নবজাত শিশুকে প্রয়োজনমতো পরিচর্যা না-করা এমনকি পিতামাতার অপরিচ্ছন্নতা ছোঁয়াচে রোগ ডেকে আনতে পারে। ফলে শিশুমৃত্যু ঘটে।

সারণি ১৮.১৮ পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুমৃত্যুর হার (প্রতি ১০০০ জন জীবিত নবজাতক প্রতি)

	গরিব মানুষের মধ্যে	ধনীদের মধ্যে
মধ্যম মানের মানব উন্নয়নের দেশসমূহ :		
ব্রাজিল	৯৯	৩৩
কলম্বিয়া	৩৯	১৬
পেরু	৬৩	১১
ফিলিপিনস্	৬৬	২১
ইন্দোনেশিয়া	১০৯	২৯
ভারত	১৪১	৪৬
পাকিস্তান	১২৫	৭৪
নেপাল	১৩০	৬৮
মাদাগাস্কার	১৪২	৪৯
ক্যামেরুন	১৮৯	৮৮
নিম্ন মানের মানব উন্নয়নের দেশসমূহ :		
কেনিয়া	১৪৯	৯১
নাইজিরিয়া	২৫৭	৭৯
নাইজার	২০৬	১৫৭

[উৎস : Human Development Report, 2007-08]

১৮.৯.১০ অধিক শিশুমৃত্যুর গুরুত্ব ও ফলাফল (Significance and Effects of High Infant Morality)

শিশুমৃত্যুর হার বেশি হলে তার প্রভাব সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুভূত হয়। যেমন—

(১) উচ্চ শিশুমৃত্যুর হার দম্পতির মধ্যে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার অনিশ্চয়তা তৈরি করে। ফলে জন্মহার বৃদ্ধি পায় ও জনবিস্ফোরণের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ উচ্চ মৃত্যুহার উচ্চ জন্মহারেরও কারণ।

(২) উচ্চ মৃত্যুহার যখন জন্মহারকেও দ্রুত করে তোলে তখন পরিবারে সন্তান ভরণ-পোষণের খরচ বাড়ে। ফলে সঞ্চয় কমে। ভোগ্যপণ্যের জন্য খরচ কমে। বিনিয়োগ কমে এবং সামগ্রিকভাবে অর্থনীতি অনুন্নত হয়।

(৩) শিশুর মৃত্যুর উচ্চহার জনসংখ্যার গঠন বা কাঠামোকে (population structure) ক্ষতিগ্রস্ত করে। কারণ শিশুমৃত্যুর এই উচ্চহারের ফলে ভবিষ্যতে কর্মক্ষম জনসংখ্যার অভাব দেখা দিতে পারে।

(৪) শিশুমৃত্যুর হার বেশি হলে দম্পতি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে অনাগ্রহী হয়। এর ফলে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি ব্যাহত হয়।

(৫) পরিবারে শিশুর জন্ম ও মৃত্যুর সংখ্যা বেশি হলে জীবিত শিশু অনেকক্ষেত্রেই অবহেলিত হয়। স্নেহবঞ্চিত এই শিশুর মানসিক বিকাশ অসম্পূর্ণ হয় এবং ভবিষ্যতে এই শিশু তার পরিণত বয়সে অসামাজিক কাজে জড়িয়ে পড়তে পারে। সুতরাং, সমাজ ও অর্থনীতিকে মজবুত করতে হলে শিশুমৃত্যুর হার কমিয়ে ফেলা ও সঙ্গে সঙ্গে জন্মহার হ্রাস করা একান্ত জরুরি।

১৮.৯.১১ মৃত্যুহার বেশি হওয়ার কারণ বা মৃত্যুহারের নিয়ন্ত্রক (Controlling Factors of High Mortality)

(১) **আয় :** মানুষের স্বল্প আয় প্রাথমিকভাবে মৃত্যুহার বাড়িয়ে দেয়। কারণ পরিবারের মোট আয় অল্প হলে সুষম খাদ্যের বন্দোবস্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে রোগ ও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ে। এ ছাড়া আয় কম হলে বা আয় হঠাৎ কমে গেলে মানসিক হতাশা থেকেও অপমৃত্যুর ঘটনা ঘটে।

(২) **পেশা ও পেশাগত ঝুঁকি :** জীবনের ঝুঁকি বা রোগের ঝুঁকি নিয়েও বহু মানুষ এমন পেশায় নিযুক্ত হতে বাধ্য হন যে, অপরিণত বয়সে তাঁদের মৃত্যু হতে পারে। খনির কাজ, মিস্ত্রির কাজ, কলকারখানায় শ্রমিকের কাজে এ-ধরনের ঝুঁকি আছে। ফলে এদের মধ্যে মৃত্যুহার বেশি। সেই তুলনায় কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের পেশাগত বিপদের আশঙ্কা কম।

(৩) **স্বাস্থ্য পরিসেবার অভাব :** উপযুক্ত স্বাস্থ্য পরিসেবার অভাবে মৃত্যুর হার বাড়ে। কারণ জনসংখ্যার অনুপাতে হাসপাতালের অপ্রতুলতা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালগুলিতে পরিচ্ছন্নতার অভাব, রোগীর জন্য শয্যার কম সংখ্যা, ওষুধের অভাব, রক্তের অভাব, চিকিৎসকের সংখ্যার তুলনায় রোগীদের সংখ্যাধিক্য অর্থাৎ চিকিৎসক-রোগীর নেতিবাচক অনুপাত ইত্যাদি নানা কারণে, বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে, মৃত্যুহার বেশি হয়।

(৪) **নারী-পুরুষের অনিয়ন্ত্রিত মেলামেশা :** নারী-পুরুষের অনিয়ন্ত্রিত মেলামেশার কারণে HIV / AIDS রোগগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে দ্রুতহারে বেড়ে চলেছে। আফ্রিকার দেশগুলিতে এই রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব আছে।

(৫) **শিক্ষার অভাব ও অপ্রতুল স্ত্রী-শিক্ষা :** শিক্ষার অভাবের সাথে মরণশীলতার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। বিশেষত স্ত্রী-শিক্ষার হার যে দেশে কম সেখানে মৃত্যুহার বেশি। যেমন— ক্যামেরুন, বুরুন্ডি, ইথিয়োপিয়া, সেনেগাল, নাইজিরিয়া প্রভৃতি।